বাংলাদেশের শিল্প

ইউনিট ৮

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। সরকার এই খাতের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে নানারূপ নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই খাতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয়নি। এজন্য জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান প্রায় অপরিবর্তিত আছে। এ ইউনিটে বাংলাদেশের শিল্পের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হবে।

পাঠ ১ : বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বৃহদায়তন শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবেন ;
- ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবেন ;
- কুটির শিল্পের কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বৃহদায়তন শিল্প

বাংলাদেশের শিল্পখাতে প্রধানত তিন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বৃহদায়তন শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প। তবে এ তিন শ্রেণীর শিল্পের কোনো সঙ্গতিপূর্ণ সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বৃহদায়তন শিল্পের উপাত্ত সংগ্রহ করে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংজ্ঞা অনুসারে ১০ জন বা এর বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বৃহদায়তন শিল্প বলা যায়। এই শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে মাঝারি শিল্পও অন্তর্ভুক্ত আছে।

ক্ষুদ্র শিল্প

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর উপাত্ত সংগ্রহ করে। এই সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে ১০ থেকে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে এবং ২৫ লক্ষ টাকার কম স্থায়ী সম্পদ আছে এরূপ শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। তবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ২০ জনের বেশি শ্রমিক থাকলেও যদি সে প্রতিষ্ঠান যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার না করে তবে সেটিও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কুটির শিল্প

যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ বা সবই পরিবারের লোক, আংশিকভাবে বা পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকে এবং যেগুলোতে ১০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করেনা সেগুলোকে বুঝায়। তবে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০ জন পর্যন্ত শ্রমিক থাকলেও তা কুটির শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের শিল্প খাত এক জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি নয়। এর মধ্যে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে আমদানিকৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। আবার চিরায়ত প্রযুক্তি এবং পারিবারিক শ্রম ব্যবহৃত হয় এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য চলতি উপাত্ত পাওয়া মুশকিল। তবে যে উপাত্ত পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্পখাতের জাতীয় আয়ে শতকরা ৬৫ ভাগ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ শতকরা ৩৫ ভাগ অবদান রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের শিল্পখাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে –
   ক. তিন শ্রেণীর খ. দুই শ্রেণীর
   গ. এক শ্রেণীর ঘ. উপরের একটিও নয়।

২. কুটির শিল্পে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিক
   ক. ভাড়াকৃত শ্রমিক খ. পারিবারিক শ্রমিক
   গ. বন্ধু-বান্ধব ঘ. উপরের একটিও নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৃহদায়তন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বলতে কি বুঝায় ?

পাঠ - ২ : বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৭.২.১ বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা যায় :

১. **দেশীয় অর্থনীতির ছোট আয়তন :** বাংলাদেশের জাতীয় আয় কম। ফলে লোকের ক্রয় ক্ষমতা কম এবং এজন্য শিল্পদ্রব্যের বাজার ছোট। দেশীয় লোকের চাহিদা পূরণের জন্য যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান হয় তাদের দ্রব্যের চাহিদা কম বলে তাদের দ্রুত প্রবৃদ্ধি হয় না।

২. **পাটজাত দ্রব্যের হ্রাসমান চাহিদা :** পাটজাত দ্রব্যের শিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্প ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এজন্য রপ্তানীমুখী এ শিল্পটির উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

৩. **উদ্যোক্তার অভাব :** বাংলাদেশে উদ্যোক্তা শ্রেণীর অভাব আছে। ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দু শ্রেণী ও পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানী ও উদ্বাস্তু উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ হওয়ার পর শিল্প জাতীয়করণ করার ফলে উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠেনি। ১৯৭০ দশকের শেষ দিক হতে উদ্যোক্তা শ্রেণী ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

৪. **অর্থ সংস্থানের অভাব :** শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ঋণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্প ঋণের পরিমাণ কম। পূর্বে কম সুদে শিল্প ঋণ প্রদানের অভিজ্ঞতা আবার দুঃখজনক। অনেক শিল্প উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপী হয়েছেন। এখন বাজার নির্ধারিত সুদের হারে ঋণ দেয়া হয়।

৫. **দুর্বল অবকাঠামো :** বাংলাদেশের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ সরবরাহে লোড শেডিং, ভোল্টেজ উঠানামা ইত্যাদি কারণে শিল্প উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, গ্যাস সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত এবং এসবের সার্বিক সেবার মান অত্যন্ত নিম্ন।

৬. **মানব সম্পদের স্বল্পতা :** শিল্পায়ন যত অগ্রসর হয়ে ততই দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশ শিক্ষার হার কম এবং কারিগরী ও পেশাগত শিক্ষার পরিমাণ আরো কম। তদুপরি নানাবিধ কারণে শিক্ষার মানও নিচু। এজন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর অভাব দেখা যায়।

৭. **প্রযুক্তির পশ্চাদপদতা :** শিল্প উন্নয়নের একটি বড় নিয়ামক হল প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করা হয় না বললেই চলে। জাতীয় পর্যায়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা বিদেশ থেকে লব্ধ প্রযুক্তি দেশের অবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য যে গবেষণা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

৮. **সরকারী নীতি :** এক সময় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারী নীতিমালা, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি ব্যক্তিগত খাতের উন্নয়নের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। ১৯৮০-এর দশক থেকে শিল্প ও বাণিজ্যনীতি ক্রমে উদারীকরণের ফলে এসব বিঘ্ন অনেকাংশে দূর হয়েছে।

৯. **শ্রমিক অসন্তোষ :** বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক অসন্তোষ লেগেই আছে। এর ফলে বিনিয়োগ নিরূৎসাহিত হয়।

৭.২.৩ শিল্পের সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশে শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যায় :

১. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি :** দেশের জনগণের শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য কৃষি ও গ্রামীণ খাতে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গ্রামের জনগণ সাধারণতঃ দেশীয় পণ্য বেশি কেনে।

২. **উদ্যোক্তা শ্রেণী :** দেশে যাতে ব্যক্তিগত খাতে একটি উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে ওঠে সেজন্য সরকার ও ব্যক্তিগত খাতের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা থাকা দরকার। ব্যক্তিগত খাতের বিকাশ পথে অন্তরায় হয় এরূপ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সরকারী আইন কানুন দূর করা দরকার।

৩. **অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা :** শিল্পখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। জনগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম সঞ্চয়ের মাধ্যম তৈরি করা দরকার। দেশে যে কালো টাকা আছে তা শিল্পখাতে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ দেয়া দরকার। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

৪. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** অবকাঠামোর উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। টেলিযোগাযোগ, সড়ক, বন্দর, অভ্যন্তরীণ, নৌ-চলাচল প্রভৃতির উন্নতির জন্য সরকারী ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৫. **মানব সম্পদ উন্নয়ন :** দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ বৃদ্ধির করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত কারিগরী ও পেশাগত শিক্ষার প্রসার ও মান বৃদ্ধি করার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৬. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তি দেশীয় অবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

৭. **শ্রমিক অসন্তোষ :** শ্রমিক অসন্তোষ দূর করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা – শ্রমিক-সরকার সম্পর্কের উন্নতি হওয়া দরকার। এজন্য আইন সংশোধন করা যায়।

৮. **শিল্প উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি :** দেশে উন্নয়নের পরিবেশ তৈরির জন্য রাজনৈতিক কারণে ঘন ঘন হরতাল-ধর্মঘট বন্ধ করার দরকার এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা নয়?

ক. উদোক্তার অভাব　　খ. দুর্বল অবকাঠামো
গ. বন্যা ও খরা　　ঘ. শ্রমিক অসন্তোষ

২. বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যেতে পারে?

ক. প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি　　খ. অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা
গ. উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি　　ঘ. উপরের সব কটি

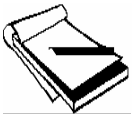

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিল্পের চারটি সমস্যা লিখুন।
২. শিল্পের সমস্যা সমাধানের চারটি উপায় লিখুন।

পাঠ - ৩ : বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৭.৩.১ : বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশে যে তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তার মধ্যে মূলধন ও উৎপাদনের দিক থেকে বৃহৎ শিল্প সবচে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল:

১. **জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি :** বৃহৎ শিল্পে শ্রমিক প্রতি মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বেশি। সুতরাং বৃহৎ শিল্প জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেশি অবদান রাখে।

২. **কৃষি উন্নয়ন :** কোন কোন বৃহৎ শিল্প কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে। যেমন – পাট, চা, চিনি, সিগারেট ইত্যাদি। এসব শিল্পের উন্নতি হলে কাঁচামালের ব্যবহার বাড়বে এবং ফলে কৃষির উন্নতি হবে।

৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার :** বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক শিল্পগুলো বৃহৎ শিল্প। যেমন – সার, সিমেন্ট, চীনামাটির পাত্র ইত্যাদি শিল্প। এসব শিল্পের উন্নয়ন হলে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে।

৪. **রপ্তানী বৃদ্ধি :** রপ্তানিমুখী শিল্পের অনেকগুলোই বৃহৎ শিল্প। যেমন – পোশাক, চামড়া, চিংড়ী, চীনামাটির পাত্র বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। বৃহৎ শিল্পের দেশের রপ্তানী বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** বৃহৎ শিল্পে সাধারণতঃ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রযুক্তির অনুসরণে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ফলে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে।

৬. **দক্ষ শ্রমিক শ্রেণী :** বৃহৎ শিল্পে সাধারণতঃ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এর ফলে দেশে একটি দক্ষ শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব নয় কোনটি?

ক. জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি　　খ. কুটির শিল্পের উন্নতি
গ. রপ্তানি বৃদ্ধি　　ঘ. প্রযুক্তির উন্নয়ন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পাঠ - ৪ : কতিপয় বৃহৎ শিল্পের বর্তমান অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কতিপয় বৃহৎ শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কতিপয় বৃহৎ শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কতিপয় বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশে যে সকল বৃহৎ শিল্প আছে তার মধ্যে বস্ত্র, পাট, কাগজ, সার, সিমেন্ট, চিনি, এম.এস. রড, চা, পানীয়, সাবান ও ডিটারজেন্ট এবং চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি শিল্প প্রধান। এখানে পাট, বস্ত্র ও পোষাক, চা, কাগজ ও চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পাঠ শিল্প

বাংলাদেশে বর্তমানে ৭৭টি পাট কল আছে। এর মধ্যে ৪০টি সরকারি খাতে এবং ৩৭টি ব্যক্তিগত খাতে। এই পাটকলগুলোতে মোট ১ লক্ষ ৪৫ হাজার স্থায়ী শ্রমিক কাজ করে। বর্তমানে বছরে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং এর প্রায় ৮৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানি হয়। পাটকলগুলোতে চট, থলে, দড়ি, কার্পেট, পর্দার কাপড়, জিড প্লাস্টিকের আসবাবপত্র ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। পাট থেকে মোটা সুতা, কাগজ ইত্যাদি তৈরির চেষ্টা চলছে। তবে তা এখনও বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়নি। পাটজাত দ্রব্য থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮ ভাগে আসে।

পাট শিল্পের সমস্যা

১. **আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা কম :** পাট শিল্পের প্রধান সমস্যা হল আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস। বড় বড় কন্টেইনারে মাল পরিবহণ, পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি থেকে তৈরি কৃত্রিম সুতা, দড়ি, থলে, কাগজের থলে ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পাটজাত দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক চাহিদা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

২. **পরিবর্তনশীল যোগান :** ধান ও পাটের উৎপাদন এবং আবহাওয়ার উপর পাটের উৎপাদন নির্ভর করে। দেখা যায় পাটের উৎপাদন এক বছরের তুলনায় আরেক বছর খুব বেশি পরিবর্তনশীল। এজন্য পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দাম খুব বেশি উঠানামা করে। আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতারা এরূপ পরিবর্তনশীল দাম বিশিষ্ট দ্রব্য কিনতে আগ্রহী হয় না ; তারা বিকল্প দ্রব্য যার দাম ও যোগান স্থিতিশীল তা কিনতে চায়।

৩. **পাটকলগুলোর সমস্যা :** দেশের পাটকলগুলোয় নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। সরকারী পাটকলগুলোতে প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অদক্ষতা, অতিরিক্ত শ্রমিক, শ্রমিক অসন্তোষ, পুরাতন যন্ত্রপাতি, উঁচু উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়। বেসরকারী কলগুলোতেও এসব সমস্যা রয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত ঋণ ও মূলধনের অভাবজনিত সমস্যা রয়েছে।

৪. **লোকসান :** পাটকলগুলোতে বিশেষতঃ সরকারি পাটকলগুলোতে লোকসান সমস্যা একটি বড় সমস্যা।

সমস্যার সমাধান

পাটশিল্পের সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন :

১. **আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি :** আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চিরায়ত চাহিদা কমে গেছে। চাহিদা বৃদ্ধির জন্য পাটজাত দ্রব্যের নতুন নতুন ব্যবহার উদ্ভাবন করতে হবে এবং কম খরচে সেসব পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে।

২. **উৎপাদন ব্যয় হ্রাস :** পাটের উৎপাদন লাভজনক করার জন্য ধানের ন্যায় পাটের ক্ষেত্রে উফশী প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার করা দরকার। এছাড়া পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের খরচ কমানোর জন্য পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন, শ্রমিক সংখ্যা যৌক্তিকীকরণ এবং শ্রমিক অসন্তোষ দূরীকরণ প্রয়োজন।

৩. **দেশীয় ব্যবহার বৃদ্ধি :** দেশে ব্যবহার হবে পাট থেকে এরূপ দ্রব্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

বস্ত্র ও পোশাক শিল্প

বস্ত্র শিল্পের ৪টি অংশ – সুতা উৎপাদন, বস্ত্র উৎপাদন, রংকরণ ও প্রিন্টিং এবং তৈরি পোশাক। বিভিন্ন পর্যায়ের সমস্যার মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে এবং সমাধানের মধ্যেও এজন্য পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে সুতা উৎপাদনের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে ৫৯.৮ মিলিয়ন কেজি সুতা উৎপাদিত হয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০৯.৯ মিলিয়ন কেজিতে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাদেশ সুতা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মোট চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ সুতা দেশে উৎপাদিত হয়। অবশিষ্ট সুতা আমদানি করা হয়।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই সময়ে রাষ্ট্রীয় খাতে পরিচালিত বৃহদায়তন মিলগুলোর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তা দেশের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে সক্ষম নয়। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত বস্ত্রের ব্যবহার দ্বিবিধ। প্রথমত, দেশের মানুষের বস্ত্রের চাহিদা পূরণ। দ্বিতীয়ত, দেশের রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের চাহিদা আংশিকভাবে পূরণ। বস্ত্র উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বিধায় বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বস্ত্র আমদানি করে। বাংলাদেশ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের জন্য গড়ে ২ – ৩ বিলিয়ন গজ বস্ত্র আমদানি করে।

সুতা ও বস্ত্রশিল্পের সমস্যা

১. **আমদানি নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশে যে তুলা উৎপাদিত হয় তাতে দেশের চাহিদা মেটেনা। এজন্য সুতা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় তুলা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আবার যে পরিমাণ সুতা উৎপাদিত হয় তাতে দেশের চাহিদা মেটেনা। এজন্য বিদেশ থেকে সুতা আমদানি করতে হয়। এর ফলে উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে।

২. **সেকেলে প্রযুক্তি :** বিগত কয়েক বছরে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিক সুতা ও বস্ত্র মিল এবং যৌগিক বস্ত্রমিল স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ সুতা ও বস্ত্রমিল পুরাতন। এসব মিলে পুরাতন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। ফলে এসব মিলে উৎপাদিত পণ্যের মান নিচু হয়।

৩. **বিদেশী প্রতিযোগিতা :** বিদেশ থেকে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়ভাবে আমদানিকৃত অপেক্ষাকৃত সস্তা সুতা ও বস্ত্রের সঙ্গে দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।

৪. **অন্যান্য সমস্যা :** এছাড়া সুতা ও বস্ত্রশিল্পের আরো কিছু সমস্যা রয়েছে। এসবের মধ্যে কারখানার ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, শ্রমিকের অদক্ষতা, শ্রমিক আন্দোলন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণের অভাব ইত্যাদি অন্যতম।

সমস্যা সমাধানের উপায়

১. **আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ :** তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল এবং সুতার আমদানি নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দেশে তুলা চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তুলাজাত ও কৃত্রিম তন্তুজাত সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন দেশে উৎপাদিত পণ্যের দাম আমদানিকৃত পণ্যের তুলনায় খুব বেশি না হয়।

২. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** দেশে আধুনিক প্রযুক্তির কারখানা স্থাপন এবং পুরাতন কারখানাসমূহের প্রযুক্তির আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

৩. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** এই খাতে দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪. **বেসরকারীকরণ :** সরকারী খাতের লোকসানকারী উদ্যোগসমূহ সহজ শর্তে ব্যক্তিগতখাতে হস্তান্তর করা দরকার।

৫. **অন্যান্য ব্যবস্থা :** দক্ষ ব্যবস্থাপক ও সুশৃংখল শ্রমিক শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। শ্রমিক আন্দোলন কমানো, বিদ্যুৎ সমস্যার উন্নয়ন এবং সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

পোশাক শিল্প

তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার শিল্প বাংলাদেশের একটি দ্রুত বিকাশমান শিল্প। এটি পুরোপুরি রপ্তানীমুখী শিল্প। ১৯৭৭ – ৭৮ সালে তৈরি পোশাক কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি। বর্তমানে এই সংখ্যা ৩ হাজারের কাছাকাছি। ১৯৮১ – ৮২ সালে দেশে ০.১৩ মিলিয়ন ডজন পোশাকে তৈরি হয় এবং ১৯৯৮ – ৯৯ সালে প্রায় ৭৪ মিলিয়ন ডজন তৈরি পোশাক উৎপাদিত হয় এবং এ থেকে ৩.২ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হয়। একই বছরে নীট ওয়্যার দ্রব্য রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ১.১৫ বিলিয়ন ডলার। এই উভয় উৎস থেকে দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ রপ্তানি আয় হয়।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান বাজার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। নীটওয়্যার দ্রব্যের প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ। বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্য এসব দেশে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করে।

এটি একটি আমদানি নির্ভর শিল্প। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান আমদানি করতে এই শিল্পের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭০ ভাগ ব্যয়িত হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বোতাম, জিপার, কার্টন ইত্যাদির বেশির ভাগ এখন দেশে তৈরি হয়।

পোশাক শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নিচের সমস্যাসমূহ দেখা যায় :

১. **কম মূল্য সংযোজন :** ব্যবহৃত বস্ত্রের বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। পোশাক কারখানাগুলো বিদেশী ফার্মের চাহিদা অনুযায়ী পোশাক তৈরি করে সরবরাহ করে। এর ফলে দেশের উপাদান দ্বারা শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ মূল্য সংযোজিত হয়।

২. **বিদ্যুৎ বিভ্রাট :** বিদ্যুৎ বিভ্রাট এই শিল্পের জন্য একটি সমস্যা সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ সমস্যা এড়ানোর জন্য অনেক ফার্ম নিজস্ব জেনারেটর ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এতে উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে এবং কারখানার মুনাফার হার কমে যায়।

৩. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক কারণে কারখানা বন্ধ থাকলে তা সমস্যার সৃষ্টি করে। পোশাকের ফরমাশ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরবরাহ করতে না পারলে রপ্তানিকৃত পোশাক বিদেশী আমদানিকারক গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারে। এ অবস্থায় উৎপাদক ফার্মসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৪. **ব্যাংক ঋণের অসুবিধা :** তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ সাধারণত ঋণ সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু কোন কারণে যেমন – সময়মত ফরমাশ যোগান দিতে ব্যর্থ হলে ফার্ম ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। তখন ফার্ম ব্যাংক থেকে আর ঋণ পায় না। এতে ফার্ম বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৫. **কাজের পরিবেশ :** কারখানার কাজের পরিবেশ আমদানিকারক দেশের মনঃপুত না হলে আমাদের তৈরি পোশাক আমদানি করতে অস্বীকার করতে পারে।

সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিচের ব্যবস্থাসমূহ নেয়া যায় :

১. **পশ্চাৎ সংযুক্তি শিল্প স্থাপন :** পোশাক শিল্পের আমদানি নির্ভরতা কমানোর জন্য বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন আবশ্যক। এজন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সুতা, বোনা কাপড়-এর কারখানা স্থাপন করা দরকার। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে দেশে উৎপাদিত কাপড়ের মান যেন নিচু এবং দাম বেশি না হয়।

২. **বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নয়ন :** দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে পোশাক শিল্প যথাযথ পরিমাণে নিয়মিত বিদ্যুৎ পায়।

৩. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন :** দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত পোশাক শিল্প হরতালের আওতামুক্ত রাখা যাতে পোশাক শিল্পে নিরূপদ্রবভাবে উৎপাদন কাজ চলতে পারে।

৪. **ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা :** পোশাক শিল্পে পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ঋণের অভাবে কারখানা বন্ধ না হয়।

৫. **কাজের পরিবেশ :** কারখানার কাজের পরিবেশ উন্নত হওয়া দরকার যাতে শ্রমিকেরা ভাল পরিবেশে কাজ করতে পারে।

৬. **সঠিক বিনিময় হার :** রপ্তানিকৃত পোশাকের দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি হলে আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা কমে যায়। এটি যাতে না হয় এজন্য টাকার বিনিময় হার যুক্তিশীল স্তরে রাখা প্রয়োজন।

চা শিল্প

চা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ও রপ্তানী ফসল। চা শিল্প গ্রামীণ কর্মনিয়োগের সুযোগ বিশেষতঃ মহিলাদের কর্মনিয়োগের সুযোগ দেয় এবং গ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখে। বাংলাদেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। গত ১০ বছরে এই বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার শতকরা ৩ ভাগ। বাংলাদেশে ১৯৯৭ – ৯৮ সালে মোট ৫৮.৬১ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপাদিত হয়। সাম্প্রতিককালে দেশে উৎপাদনের তুলনায় অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ

বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য রপ্তানির পরিমাণ কমে গেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫৮ টি চা বাগান আছে। এর অধিকাংশই বৃহত্তর সিলেট জেলায় অবস্থিত।

চা শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশে চা শিল্পের নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ দেখা যায় :

১. **ভূমির অদক্ষ ব্যবহার :** অনেক চা বাগানের জমি দক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় না। চা চাষে ব্যবহৃত হয়না এরূপ জমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়না।

২. **অদক্ষ ব্যবস্থাপনা :** অধিকাংশ চা বাগানের অবস্থা খারাপ এবং ফলন কম। মুনাফা কম হওয়ায় অনেক চা বাগান ঋণ নিতে পারে না। ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও কম হয়।

৩. **ভূমি ইজারাদান কর্মসূচী :** সরকারের ভূমি ইজারা দান কর্মসূচীর ফলে অলাভজনক বাগানও ভূমি দখল করে রাখতে পারে। চা চাষের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ জমি ব্যবহৃত হলেই ভূমি বিনামূল্যে ব্যবহার করতে ও ফেলে রাখতে পারে।

৪. **বেশি শ্রম-খরচ :** কৃষিখাতের অন্যান্য উপখাতের তুলনায় চা উপখাতে শ্রমিকের মজুরির হার বেশি। চুক্তি অনুসারে চা বাগান শ্রমিককে কর্মচ্যুত করতে পারেনা এবং লাভ না হলেও নির্দিষ্ট হারে শ্রমিককে মজুরি দিতে হয়।

৫. **চা বোর্ডের উদ্দেশ্য :** বর্তমান বাজার ও শিল্পের অবস্থা বিবেচনায় চা বোর্ডের উৎপাদন অধীন জমির পরিমাণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সফল নাও হতে পারে।

সমস্যা সমাধানের উপায়

১. **বৈচিত্রকরণের জন্য সাহায্য :** যে সব জমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে কিংবা চা চাষ হয় না সেসব জমিতে অন্যান্য বাণিজ্যিক ও লাভজনক ফসল উৎপাদন করা যায়। এজন্য চা বাগানগুলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া যায়।

২. **ব্যবস্থাপনা দক্ষতার বিস্তার :** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় এবং ফলন বৃদ্ধি করা যায়। জমির দক্ষ ব্যবহার করতে পারে এরূপ ফার্মের কাছে জমির মালিকানা হস্তান্তর করা যায়।

৩. **ভূমি ইজারাদান পদ্ধতি পুনঃপরীক্ষা :** বর্তমান ভূমি ইজারাদান পদ্ধতির টেকসইতা ও দক্ষতা পুনঃপরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং ভূমির দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনে তা সংশোধন করা উচিত। অধিকাংশ বাগানের ৩৫ বৎসর মেয়াদী ইজারা ২০০৩ সালে উত্তীর্ণ হবে। এ সময়ের মধ্যেই এ পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন।

৪. **ক্ষুদ্র চাষীর সম্ভাবনা :** ক্ষুদ্র চাষী শ্রম ও মূলধন যথাযথভাবে ব্যবহার করে কাম্য উৎপাদ উৎপাদনে সক্ষম হয়। চা চাষে ক্ষুদ্র চাষী ব্যবস্থা ব্যবহার করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যায়।

৫. **চা বোর্ডের ভূমিকা পরীক্ষা :** চা উৎপাদন ভূমির পরিমাণ বাড়িয়ে চা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো চা বোর্ডের বর্তমান উদ্দেশ্য। এটি না করে বোর্ডের উচিত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা।

কাগজ শিল্প

কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বাংলাদেশে ২টি কাগজ মিল ১টি নিউজপ্রিন্ট মিল এবং ১টি কাগজের মন্ড তৈরির কারখানা আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে কাগজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং নিউজপ্রিন্ট দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা যেত। কিন্তু লেখাও ছাপার জন্য কাগজের চাহিদা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে কাগজের ঘাটতি থাকে। বর্তমানে দেশে খবরের কাগজ, সাপ্তাহিকী ইত্যাদির সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় নিউজপ্রিন্ট আমদানি করতে হয়। বর্তমান কালে কাগজ শিল্পের উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে শিল্পজাত দ্রব্য পরিবহণ বিশেষতঃ রপ্তানি দ্রব্য পরিবহনের জন্য মোড়ক দ্রব্য এবং পিজাবোর্ডের বাক্স উৎপাদন। ব্যক্তিগত খাতে এ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

কাগজ শিল্পের সমস্যা

কাগজ শিল্পের প্রধান সমস্যা হল কারখানার যন্ত্রপাতির ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা এবং কাঁচামালের অপর্যাপ্ত যোগান।

সমস্যার সমাধান

কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মিলগুলোর সুষমকরণ, আধুনিকায়ন ও প্রতিস্থাপন প্রয়োজন। কাঁচামালের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গাছপালার বাণিজ্যিকভাবে চাষ প্রয়োজন।

চামড়া শিল্প

চামড়া শিল্প একটি রপ্তানিমুখী শিল্প। বর্তমানে বাংলাদেশে ২০০টিরও অধিক চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা আছে। এর মধ্যে চামড়া পাকা করার কারখানা আছে ৪০টি। দেশে ১৪০ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া উৎপাদিত হয়। এর শতকরা ৮০ ভাগ গরুর চামড়া।

চামড়া শিল্পের সমস্যা

ঋণের অভাব : চামড়া শিল্পের প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের অভাব। ঋণের অভাবে অনেক চামড়ার কারখানা কাঁচামাল কিনতে পারেনা এবং ফলে কারখানা পূর্ণ উদ্যমে চালাতে পারেনা।

ফ্যাশন মাফিক জুতা : চামড়াজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার পরিবর্তনশীল। এই বাজারের সঙ্গে মিল রেখে সঠিক গুণগতমান ও সঠিক ফ্যাশনের জুতা আন্তর্জাতিক বাজারে যোগান দিতে হয়। বাংলাদেশ নানা প্রতিকূলতার কারণে এই উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি।

সমস্যা সমাধানের উপায়

১. **পর্যাপ্ত ঋণ যোগান :** চামড়া শিল্পে প্রয়োজনীয় ঋণের যোগান দেয়া উচিত।

২. **ফ্যাশন মাফিক দ্রব্য :** চামড়াজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঠিক গুণের ও সঠিক ফ্যাশনের জুতা সরবরাহ করে না। এজন্য এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

পাঠ - ৫ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায়, শিল্পখাতের মূল্য সংযোজনের শতকরা ৫২.৩ ভাগ এবং কর্মনিয়োগের শতকরা ৮৬.৮ ভাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ঘটে। নিচে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. **অতিরিক্ত আয় ও আয় বৈষম্য হ্রাস :** বাংলাদেশের শতকরা ৬৩.২ ভাগ শ্রমিক কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষি উৎপাদন মৌসুমী হওয়ায় বছরের সকল সময় এসব শ্রমিক সমানভাবে কর্মসংস্থান পায় না। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এসব শ্রমিকের জন্য অতিরিক্ত আয়ের পথ সুগম করে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে আয় করে। তাদের আয় বৃদ্ধির ফলে আয় বৈষম্য হ্রাস পায়।

২. **অতিরিক্ত কর্মসংস্থান :** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেকারত্ব ও ছদ্মবেকারত্ব রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মসংস্থানের ফলে এ ধরনের বেকারত্ব হ্রাস পায়।

৩. **মহিলাদের কর্মসংস্থান :** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিশেষতঃ কুটির শিল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। তাঁরা দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘরে বসে কুটির শিল্পে কাজ করতে পারেন।

৪. **সংযুক্ত প্রভাব :** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সংযুক্তি প্রভাব রয়েছে। এসব শিল্পের অনেকগুলি স্থানীয় কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। ফলে স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারী শিল্পসমূহ উৎসাহিত হয়।

৫. **রুচি মাফিক উৎপাদন :** কুটির শিল্পের অনেক দ্রব্য ক্রেতার ব্যক্তিগত রুচি ও চাহিদামাফিক উৎপাদন করা যায়। যেমন – স্বর্ণালংকার তৈরি, জামাকাপড় তৈরি, কাপড় নকশাকরণ ইত্যাদি।

৬. **জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ :** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অনেকগুলি লুপ্ত প্রায়। কিন্তু কিছু শিল্প টিকে আছে যা জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলার সংরক্ষণ করে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্প খাতের মূল্য সংযোজনের শতকরা ৫২.৩ ভাগ ও কর্মনিয়োগের শতকরা ৮৬.৮ ভাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঘটে। এই খাত (১) গ্রামীণ জনগণের অতিরিক্ত আয়ের পথ সুগম ও আয় বন্টনে বৈষম্য হ্রাস করে। (২) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। (৩) মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। (৪) সংযুক্তি প্রভাব সৃষ্টি করে। (৫) ক্রেতার রুচিমাফিক উৎপাদন করে এবং (৩) জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

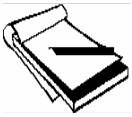

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শিল্পখাতের মূল্য সংযোজনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ঘটে?
ক. শতকরা ৫০ ভাগ খ. শতকরা ৫২.৩ ভাগ
গ. শতকরা ৪৭.৭ ভাগ ঘ. শতকরা ৮৬.৮ ভাগ

২। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান কোনটি?
ক. কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করে খ. আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে
গ. মহিলাদের কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি করে ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ করে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ - ৬ : কুটিরশিল্প ও স্বকর্মসংস্থান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কুটির শিল্পের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

কুটির শিল্প

কুটির বা বাড়ীতে সাধারণতঃ পারিবারিক সদস্যদের পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন শ্রম দানের ভিত্তিতে পরিচালিত ম্যানুফ্যাকচারিং বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যার মূলধনের পরিমাণ টাকা ৫০ লক্ষের উপরে নয় এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কুটিরশিল্প হিসাবে পরিচিত।

স্ব–কর্মসংস্থান

স্ব-নিয়োজিত ব্যক্তি বলতে যে ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) তার পারিবারিক কৃষিখামার বা অকৃষি উদ্যোগে মুনাফা বা পারিবারিক লাভের জন্য কাজ করে তাকে বুঝায়। এরূপ কাজের জন্য ঐ ব্যক্তি কোন মজুরি বা বেতন পায় না।

সময়ের পূর্ণ ব্যবহার

উপরের সংজ্ঞা দুটি হতে কুটির শিল্প ও স্ব-কর্মসংস্থানের মধ্যকার ঘনিষ্ট সম্পর্ক সহজে বোঝা যায়। কুটির শিল্প মূলতঃ পরিবারের সদস্যদের শ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় অর্থাৎ কুটির শিল্পের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যেরা স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। কুটির শিল্পে একজন ব্যক্তি পূর্ণকালীন কাজ করতে পারে। অথবা, পরিবারের অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে খন্ডকালীন কাজ করতে পারে। এভাবে একজন ব্যক্তির সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যববহার হয়।

বর্ণহীন সময়ে নিয়োগ

কৃষিখাতের বাৎসরিক উৎপাদন চক্রের জন্য বছরের কোনো কোনো সময়ে কৃষি শ্রমিক সাময়িক কর্মহীনতা দেখা দেয়। এ সময়ে কৃষি শ্রমিক কুটির শিল্পে নিয়োজিত হতে পারে এবং তার বেকারত্বের তীব্রতা হ্রাস করতে পারে।

অসুবিধা কবলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান

সমাজের অসুবিধা কবলিত শ্রেণী, যেমন – ভূমিহীন ও মহিলাদের জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে কুটির শিল্প দারিদ্র বিমোচনে বিরাট ভূমিকা রাখে। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় কুটির শিল্পে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা বেশি।

স্বল্প মূলধন প্রয়োজন

কুটির শিল্পে অল্প পরিমাণ মূলধনের দরকার হয়। গ্রামের দরিদ্র জনগণের পক্ষে স্বল্প মূলধন যোগাড় করা সুবিধাজনক। বেশি মূলধন যোগাড় করা সুবিধাজনক নয়। আজকাল বিভিন্ন এন.জি.ও ছোট ছোট ঋণের মাধ্যমে কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করছে। মানুষ স্বল্প পুঁজি ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম কুটির শিল্প সামগ্রী উৎপাদন করছে।

সারসংক্ষেপ

কুটির শিল্প স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কুটির শিল্প গ্রামীন শ্রমিকের সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং অপেক্ষাকৃত কর্মহীন সময়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। কুটির শিল্প সমাজের অপেক্ষাকৃত অসুবিধা কবলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কুটির শিল্প স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ উপযোগী। কেননা এই শিল্পে স্বল্প পরিমাণ পুঁজি দরকার হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. স্ব-কর্মসংস্থান বলতে কি বুঝায় ?
   ক. নিজের উদ্যোগে চাকুরি যোগাড় করা
   খ. অন্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা
   গ. পারিবারিক উদ্যোগে মুনাফা বা পরিবারের লাভের জন্য কাজ করা
   ঘ. বিনা বেতনে কোথাও চাকুরি করা।

২. কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য –
   ক. স্বল্প মূলধনের দরকার হয়
   খ. বেশি মূলধনের দরকার হয়
   গ. শ্রমিকের তুলনায় বেশি মূলধনের দরকার হয়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কুটির শিল্পের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ - ৭ : কুটির শিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কুটির শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কুটির শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৭.১ বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সমস্যাসমূহ :

বাংলাদেশের কুটির শিল্পের বহুবিধ সমস্যা দেখা যায়। এর মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

১. **পুঁজির স্বল্পতা :** বাংলাদেশের কুটির শিল্পের উদ্যোক্তারা অধিকাংশই দরিদ্র। তারা নিজেদের স্বল্প পুঁজি ব্যবহার করে ছোট আয়তনের উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে। এতে মুনাফার পরিমাণ কম হয়। ফলে কুটির শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তি কোনোভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করে উৎপাদনের আয়তন বাড়াতে সক্ষম হয় না।

২. **ঋণের অভাব :** অধিকাংশ কুটির শিল্পীদের ঋণের জন্য জামিন দেয়ার মত সম্পদ থাকে না। এজন্য তারা প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পেতে সক্ষম হয়না। আজকাল কিছু ব্যাষ্টিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্পীদের ঋণ দিচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুটির শিল্পী তার উৎপাদিতব্য পণ্যের উপর ঋণ (দাদন) নেয়। এক্ষেত্রেও তার মুনাফার পরিমাণ কম হয়।

৩. **অনুন্নত প্রযুক্তি :** কুটির শিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তি অনুন্নত। এজন্য উৎপাদনশীলতার পরিমাণ কম। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুন্নত প্রযুক্তিতে উৎপাদিত পণ্য বাজারের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্যের মান বৃদ্ধি ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাব :** কুটির শিল্পীরা উৎপাদনের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পায়না। তারা পারিবারিকভাবে এবং কাজ করতে করতে উৎপাদন প্রক্রিয়া আরম্ভ করে। এর ফলে আধুনিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয় না এবং উৎপাদন গতিশীল হয় না।

৫. **সহায়ক সেবার অভাব :** উৎপাদন কাজে সহায়ক সেবাকার্য যেমন – ঋণ, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদির জন্য কোথায় ও কার কাছ যেতে হবে এটি অনেক সময় জানা থাকেনা।

৬. **বাজারের অভাব :** কুটির শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকাংশ ক্রেতা দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এজন্য এ শিল্পের দ্রব্যের বাজার সীমিত। আজকাল অবশ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে অনেক পণ্য উচ্চবিত্ত শ্রেণীর এমনকি বিদেশীদের রুচিমাফিক উৎপাদিত হচ্ছে।

৭. **সামঞ্জস্যহীন সরকারী নীতি :** সরকারী আমদানি নীতির জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুটির শিল্প অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যেমন – উদার আমদানি নীতি বা কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ শুল্ক আরোপ ইত্যাদির জন্য কুটির শিল্পের দ্রব্য অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

এছাড়া সরকারের শিল্পনীতি ও কুটির শিল্পের জন্য প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

৭.২ বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. **পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ সরবরাহ :** কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ সরবরাহ এজন্য দেশে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। ঋণের সাহায্যে উৎপাদক বেশি পরিমাণ কাঁচামাল কিনতে ও দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

২. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** কুটির শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। এজন্য দেশে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। সম্ভব ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করা যায়।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দান :** কুটির শিল্পের উৎপাদনের গতিশীলতা আনয়নের জন্য এ শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় কাঁচামাল ক্রয়ের উৎস ও কাঁচামালের গুণাগুণ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ক্রেতার রুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কুটির শিল্পের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪. **সহায়ক সেবাদান :** কুটির শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। এসব প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্পের জন্য সব রকম সেবা দান এবং সেবা সম্পর্কিত পরামর্শ দান করতে পারে।

৫. **বাজারের অভাব :** কুটির শিল্পে উচ্চবিত্ত ও বিদেশী ক্রেতাদের জন্য নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদন করা দরকার। তাহলে বাজারের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

৬. **সরকারী নীতি :** কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য যথাযথ সরকারী নীতি দরকার। সহজ শর্তে ঋণদান, আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর শুল্ক হ্রাস ইত্যাদি নীতির মাধ্যমে সরকার কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

কুটির শিল্পের বিবিধ সমস্যার মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ : (১) পুঁজির স্বল্পতা, (২) ঋণের অভাব, (৩) অনুন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, (৪) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, (৫) সহায়ক সেবার অভাব, (৬) বাজারের অভাব, (৭) সামঞ্জস্যহীন সরকারী নীতি।
এ সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ নেয়া দরকার : (১) পর্যাপ্ত ঋণ, (২) উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, (৩) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দান, (৪) সহায়ক সেবা দান, (৫) বাজার উন্নয়ন ও (৬) যথাযথ সরকারী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

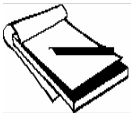

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি কুটির শিল্পের সমস্যা?

ক. পুঁজির স্বল্পতা
খ. অনুন্নত প্রযুক্তি
গ. বাজারের অভাব
ঘ. উপরের সব কটি

২. কুটির শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিচের কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যায়?

ক. প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য আমদানি।
খ. কুটির শিল্পের কাঁচামালের উপর অধিক হারে শুল্ক আরোপ।
গ. পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ।
ঘ. কুটির শিল্পীদের স্বাস্থ্য সেবা দান।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কুটির শিল্পের সমস্যাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. কুটির শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ ৮ : বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা ও বেসরকারী করণের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৮.১ সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ অর্থনীতিতে সরকারী খাত ও বেসরকারী খাত উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিককালে বেসরকারী খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদন ও বন্টনে সরকারী খাতের ভূমিকা সীমিত বা অনুপস্থিত, বেসরকারী খাতের ভূমিকাই প্রধান। অর্থনীতির কয়েকটি খাত, যেমন – ১. অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, ২. আণবিক শক্তি, ৩. বিমান পরিবহন, ৪. টেলিযোগাযোগ, ৫. বন সম্পদ আহরণ সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট সকল খাত বেসরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট সকল খাত বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। অর্থনীতির এই সামগ্রিক নীতির প্রেক্ষাপটে শিল্পখাতে ও সরকারী খাত ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট খাত ব্যতীত শিল্পখাতের অন্য কোন উপখাতই সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত করা হয়নি। অর্থাৎ শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য উৎপাদন ও বন্টনে সরকারী খাতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অপরিহার্য নয় বলে মনে করা হয়। দেশের শিল্পায়নে বেসরকারী খাত প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। এর কারণ তুলনামূলকভাবে বেসরকারী খাত অধিক দক্ষ।

শিল্প দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টনে সরকারী খাতের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির অর্থ অবশ্য এ নয় যে, দেশের শিল্পায়নে সরকারী খাতের কোন ভূমিকা নেই। বরং মনে করা হয় যে, শিল্পায়নে সরকারী খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এ ভূমিকা হবে সহায়ক ভূমিকা নিয়ন্ত্রক বা প্রত্যক্ষ উৎপাদকের ভূমিকা নয়। ব্যক্তিগত খাতের উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু সরকারী নীতিমালা এবং পর্যাপ্ত সহায়ক সেবার প্রয়োজন যেগুলো বেসরকারী খাত সরবরাহ করতে সক্ষম নয়। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষ বন্দর সেবা, দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থা, অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সুশাসন দেশের শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সরকারী খাত এসব সেবা দক্ষভাবে সরবরাহ করে দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৮.২ বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের শিল্পখাতের অধিকাংশ বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে সরকার বৃহদায়তন শিল্পের স্থায়ী সম্পদের শতকরা ৯২ ভাগের মালিকানা লাভ করে। দুটি পরস্পর সম্পর্কিত কারণে শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। প্রথমত, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে গঠনের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পূর্বে আধুনিক শিল্পখাতের অধিকাংশের মালিকানা ছিল পাকিস্তানীদের হাতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তারা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ব্যবস্থাপনার সকলে দেশ ত্যাগ করে গেলে এসব প্রতিষ্ঠানে চরম শূন্যতা দেখা দেয়।

বাংলাদেশী ব্যক্তিগত খাত ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অনভিজ্ঞ ও অক্ষম। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখার উদ্দেশ্যেও তা জাতীকরণ করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত খাতে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করে দেয়া হয়।

জাতীয়কৃত শিল্পখাতের কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। রাজনৈতিক হস্ত ক্ষেপ, দুর্নীতি, দুর্বল ব্যবস্থাপনা, উগ্র শ্রমিক সংঘ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন হয় এবং লোকসানের পরিমাণ প্রতিবছর বাড়তে থাকে। সরকারী খাতের এই লোকসান সরকারের বাজেট থেকে কিংবা ঋণ করে পূরণের চেষ্টা করা হয়। এর ফলে সরকারের অন্যান্য জরুরী কার্যক্রম অর্থায়নের সংকট দেখা দেয় এবং আর্থিক খাতেও চাপ অনুভূত হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার জাতীয়কৃত শিল্প বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৮২ সালের শিল্পনীতিতে এ সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়। এর পরবর্তীকালের শিল্পনীতিগুলোতেও এ সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যক্তিগত খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় এবং সরকারী খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে সহায়ক ভূমিকা কার্যকরী হয়।

সরকারের উন্নয়ননীতি হচ্ছে ব্যক্তিগত খাত পরিচালিত প্রবৃদ্ধি। এমতাবস্থায় উৎপাদন ও বন্টন ক্ষেত্রে সরকারী খাতের বড় ভূমিকা হবে সরকারের মৌল নীতির বিরোধী। এজন্যও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পের বেসরকারীকরণ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিচের কোন খাতটি সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত?
   ক. কৃষি — খ. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
   গ. অস্ত্র, গোলাবারুদ ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম — ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. দেশের শিল্পায়নে সরকারী খাতের ভূমিকা হবে –
   ক. সহায়কের ভূমিকা — খ. নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা
   গ. প্রত্যক্ষ উৎপাদকের ভূমিকা — ঘ. উৎপীড়কের ভূমিকা

৩. বাংলাদেশে বর্তমানে পাটকলের সংখ্যা –
   ক. ৪০টি — খ. ৭৭টি
   গ. ৩৭ টি — ঘ. ৮৭ টি

৪. পাটজাত দ্রব্যের শতকরা কত ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়?
   ক. ৮৫ ভাগ — খ. ৮০ ভাগ
   গ. ৭৫ ভাগ — ঘ. ৯০ ভাগ

৫. বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের অধিকাংশই রপ্তানি হয় –
   ক. আমেরিকা ও কানাডায় — খ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশসমূহ
   গ. সি আই এস ভূক্ত দেশসমূহ — ঘ. (ক) ও (খ)

৬. বাংলাদেশে বর্তমানে চা বাগানের সংখ্যা কয়টি?
   ক. ১৮৫ টি — খ. ১৪৮ টি
   গ. ১৬৮টি — ঘ. উপরের কোনটি নয়।

৭. বাংলাদেশের কোন রপ্তানি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা ক্রমশ কমে যাচ্ছে?
ক. পাটজাত দ্রব্য খ. চিনি
গ. তৈরি পোশাক ঘ. চামড়া

৮. পরিবর্তনশীল যোগান কোন শিল্পের সমস্যা?
ক. চামড়া খ. চা
গ. পাট ঘ. উপরের সবকটি

৯. বাংলাদেশের কোন শিল্পের আমদানি নির্ভরশীলতা সবচেয়ে বেশি?
ক. কাগজ খ. চিনি
গ. তৈরি পোশাক ঘ. সিমেন্ট

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দেশের শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।
২. বাংলাদেশে শিল্প বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লিখুন।
৩. পাটশিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।
৪. পোশাক শিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।
৫. চা শিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।